ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম
ও
মাস্টারদা সূর্য সেন

প্রভাস ঘোষ

পথিকৃৎ
৮৮বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

Bharatbarsher Swadhinata Sangram O Masterda Surya Sen
— Provash Ghosh

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মাস্টারদা সূর্য সেন — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ৩ অক্টোবর, ২০১৩

প্রকাশক ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী
পথিকৃৎ
৮৮বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১৩
যোগাযোগ ঃ ২২২৬০২৫১

মূল্য ঃ ৫ টাকা

প্রকাশকের কথা

১২ জানুয়ারি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষহীন যোদ্ধা মাস্টারদা সূর্য সেনের শহীদ দিবস। গত বছর ২০১০-এ এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস, পথিকৃৎ ও কমসোমলের উদ্যোগে কলকাতার ফণিভূষণ যাত্রামঞ্চে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মূল আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট জননেতা কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর সেই আলোচনাটি ইতিপূর্বে আমরা পথিকৃৎ-এর আগস্ট, ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। আরও বহু মানুষের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে আমরা তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি। প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য কিছুটা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেছেন। প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে তার দায়িত্ব আমাদের।

প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় বর্তমানে তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

৩ অক্টোবর, ২০১৩
কলকাতা

বিপ্লব চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম
ও
মাস্টারদা সূর্য সেন

১২ই জানুয়ারি দিবসটি একদিকে গভীর শোক ও বেদনার অশ্রুজলে সিক্ত; অন্যদিকে মহান আত্মদানের গৌরবে মহিমান্বিত। মহান বিপ্লবী মাস্টারদার শহীদের মৃত্যু বরণের স্মৃতি বিজড়িত এই দিবস। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে গিয়ে এর আগে যখন চাপেকার ভাইয়েরা, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি আত্মদান করেছেন তখনও দেশে স্বাধীনতার চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। তাঁদের আত্মদান সেদিন অনেকটা নীরবে-নিঃশব্দে ঘটে গিয়েছিল। যদিও এঁদের আত্মদানই কিছুদিন পরে এদেশের যৌবনকে দেশের স্বাধীনতার চেতনায় জাগিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ফাঁসির মঞ্চে দু'জনের আত্মোৎসর্গের ঘটনা সমগ্র দেশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। একটি মাস্টারদা সূর্য সেনের এবং অন্যটি শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিংয়ের। এর ফলে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একদিকে গভীর ব্যথা-বেদনা-শোকের প্রবাহ, অন্যদিকে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের সর্বত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছিল তীব্র ঘৃণা। মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসির সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল সকলেই জীবিত ছিলেন। এঁরা ব্যথিত হয়েছিলেন। যখন ফাঁসির সরকারি আদেশ ঘোষণা হল, শুধু অবিভক্ত বাংলায় নয়, অবিভক্ত ভারতবর্ষে সেই দিনটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের, গভীর উৎকণ্ঠার। ফাঁসির দিন ঘরে ঘরে ছিল চোখের জল, এমনকী কয়েকদিন চট্টগ্রাম

জেলার ঘরে ঘরে রান্নাও হয়নি। অগ্নিযুগের সেই ঐতিহাসিক দিন ১২ই জানুয়ারির কথা এ দেশের কয়জন মানুষ আজ স্মরণ করে? কয়জন জানে? এটা খুবই দুঃখের। এখনকার যারা ছাত্র-যুবক, সেই সব দিনের সাথে, সেই সংগ্রামের সাথে তাদের কোনও পরিচয় নেই। আমাদের কৈশোরের প্রারম্ভে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই জ্বলন্ত দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত সমাজ পরিবেশে এইসব নামগুলি ঘরে ঘরে শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হত। আমাদের মনে তা গেঁথে যেত, আমরা অনুপ্রাণিত হতাম। কিন্তু আজ আমাদের মত যাঁরা আছেন, শিক্ষক, অভিভাবক আছেন — যাঁরা আজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, তাঁদেরও অনেকের মধ্যে সেই ইতিহাস প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আমাদেরও জীবনে হয়ত তাই হ'ত, যদি আজকের গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতাম। কিন্তু আমরা পারিনি। এই যে পারিনি, তার পেছনে রয়েছে এক মহৎ মানুষের অবদান। নিতান্ত আকস্মিকভাবে তাঁর সাথে আমার যোগাযোগের সুযোগ ঘটেছিল, যেটা আমার জীবনের ধারাকে পাল্টে দিয়েছে। তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীধারার সৈনিক হিসাবে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে চলার পথে এবং উত্তরণের পথে মহান মার্কসবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তিনি হচ্ছেন সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের মহান পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনিই আমাদের এদেশের গৌরবোজ্জ্বল রেনেঁশাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে, সেই যুগের মনীষী ও বিপ্লবীদের ভুলতে দেননি। এ দেশের বিস্মৃতপ্রায় গৌরবময় অতীতকে তিনিই জাগিয়ে তুলেছেন। সে যুগের মহান চরিত্র, মনীষী, নবজাগরণের যাঁরা পুরোধা ছিলেন, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, দেশাত্মবোধে যাঁরা সে যুগে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে এসেছিলেন, মহান বিপ্লবী হিসাবে আত্মদান করেছিলেন; তাঁদের সাথে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়ে গেছেন, সেতুবন্ধন রচনা করে গেছেন, যাতে প্রথমে এঁদের থেকে পাথেয় সঞ্চয় করে কমিউনিস্ট বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি।

আজ এখানে এই অনুষ্ঠান যিনি সূচনা করেছেন, আমার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ঠিক বলতে পারেননি, আমার প্রতি আবেগের আতিশয্যে ভুল বলেছেন। 'সূর্য সেন সে যুগের বিপ্লবী নেতা, আর আমি প্রভাস ঘোষ এ যুগের বিপ্লবী নেতা' — এভাবে তিনি বিষয়টিকে রেখেছেন। এই পরিচিতিতে আমার নিজেরই সংকোচ বোধ হচ্ছে। কারণ, এটা ঠিক নয়। মাস্টারদা সূর্য সেন সে যুগের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক অসাধারণ বিপ্লবী যোদ্ধা ও নেতা, এই মূল্যায়ন সঠিক। সেই সংগ্রামের যাত্রাপথে বহু অগ্নিপরীক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন। আর আমি আজকের দিনে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার

একজন সৈনিক বা যোদ্ধা মাত্র। সে যুগের বিপ্লববাদের প্রতীক হিসাবে মাস্টারদা সূর্য সেন যেসব পরীক্ষা দিয়ে গেছেন, আমার জীবনে সেইসব পরীক্ষা এখনো আসে নি। ফলে এভাবে বলা চলে না।

আজ যে আপনাদের সামনে মাস্টারদা সম্পর্কে কিছু বলছি, সেটা, শুধু আপনাদের বলবার জন্যই নয়, একই সাথে আমার নিজের বিবেককে জাগাবার জন্যও বলছি। তাই উদ্যোক্তারাও যেমন চেয়েছেন, তেমনি আমি নিজেও খুব আগ্রহ নিয়ে এই সমাবেশে আসতে চেয়েছি।

একদিকে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, অন্যদিকে এক অবিস্মরণীয় মহান বিপ্লবী চরিত্র। দু'টিই আমাদের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমেই আমি বলতে চাই, 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটা ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং হ'তে শুরু করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষহীন ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত সকলের নামের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পক্ষ থেকেই যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রায় সকলেই পড়তে বা বলতে অভ্যস্ত, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে সবদেশেই দেখা যায় গণচেতনা জাগিয়ে তোলার ভিত্তিতে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত করার বৈপ্লবিক চিন্তা প্রথম দিকে আসে না। ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রতিবাদী মন, সাহস, শৌর্য, বীর্যকে ভিত্তি করেই প্রথমের দিকে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ শুরু হয়। সে কারণে জনগণের শত্রুর প্রতিনিধি, অত্যাচারী শাসনের প্রতিনিধির শাস্তিদান, মৃত্যুদণ্ডদান — এগুলিই সাধারণভাবে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রাথমিক রূপ হিসাবে এসেছিল বিভিন্ন দেশে। যাঁরা এভাবে শুরু করেছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন, জনসাধারণের কিছু শত্রুর ও অত্যাচারী শাসকের শাস্তিবিধান করলে, তারা সন্ত্রস্ত হবে, ভয় পাবে এবং তাদের শোষণ-জুলুম বন্ধ করবে এবং বিপ্লবীদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জনজাগরণ হবে, আরও অনেকে সংগ্রামে এগিয়ে আসবে। এটাকে বিপ্লবী চিন্তা ও বিপ্লবী সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর হিসাবেই দেখা উচিত। আমাদের দেশেও প্রথম দিকে এরকমই ছিল। এদেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরুই হয়েছিল এ ধরনের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

আমাদের দেশে জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল আরও বেশ কয়েক বছর পরে। জাতীয় কংগ্রেস প্রথম দিকে একদল পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিদের আসরের মত অনেকটা ছিল। বৈঠক, কিছু প্রস্তাব পাশ ছাড়া অন্য কাজ কিছু ছিল না। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে অনেকটা ব্যক্তিগত বা ছোটখাটো গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এর

পাশাপাশি, যাকে বলা হয় মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদ বা পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ। পেটি কথাটির অর্থ ক্ষুদ্র, তাই পেটি বুর্জোয়া মানে হল ক্ষুদ্র বুর্জোয়া, যাকে আমরা বলি মধ্যবিত্ত। পুঁজিবাদী সমাজে প্রধানত দুটি শ্রেণী থাকে — বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। মধ্যবিত্ত হল উপশ্রেণী। তার অবস্থান হল বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী। বুর্জোয়া শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার সাথে মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষার কখনও মিল থাকে, কখনও থাকে না। স্বাধীনতা সংগ্রামে বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত ভূমিকা নিতে পারে, মধ্যবিত্ত বা পেটি বুর্জোয়ারা এককভাবে সেটা পারে না। বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর মাঝখানে যেহেতু মধ্যবিত্ত উপশ্রেণী, তাই সংগঠিত শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। আবার মধ্যবিত্তের মধ্যে শিক্ষার যতটুকু প্রসার সেদিন ঘটেছিল তার প্রভাব এবং আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টির কারণে পরাধীনতার জ্বালা এদের মধ্যেই ছিল সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা ও শ্রমিক বিপ্লবভীতিজনিত কারণে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে এদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে সশস্ত্র বিপ্লব বিরোধী আপোষমুখী মানসিকতা বিরাজ করছিল, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে মধ্যবিত্তদের আপোষহীন সংগ্রামী মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ তার বিপরীত। জাতীয় কংগ্রেস গড়েই উঠেছিল আলাপ-আলোচনা, প্রস্তাব গ্রহণ, দাবিপত্র পেশ ইত্যাদির একটি মঞ্চ হিসেবে। ফলে কংগ্রেস নেতৃত্ব সামগ্রিকভাবে আপোষকামী ও সংস্কারবাদী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার কারণে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ আপোষমুখী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নি। এই মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদকে সঠিকভাবে উপলব্ধির ভিত্তিতে শ্রমিক বিপ্লবের পক্ষে কাজে লাগানো ছিল ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের দায়িত্ব। কারণ মহান লেনিন দেখিয়েছিলেন, বিংশ শতকে বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে কোনও দেশেই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পূর্ণ সফল পরিণতিতে পৌঁছতে পারে না, সেই দায়িত্ব নিতে হবে সচেতন শ্রমিকশ্রেণীকেই। ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন এই শিক্ষার ভিত্তিতে ভারতে কমিউনিস্ট হিসাবে পরিচিতদের বলেছিলেন, ভারতে জাতীয় বুর্জোয়ারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল শ্রমিক বিপ্লবের আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করছে, অপরাংশ আপোষহীন লড়াই করছে। তিনি বলেছিলেন, ভারতের কমিউনিস্টদের দায়িত্ব হচ্ছে আপোষহীন অংশ অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীদের সাথে ঐক্যসাধন করে আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টরা লেনিন ও স্ট্যালিনের এই শিক্ষার

বিপরীত কাজই করেছেন। সেদিন এই দেশে শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ একটি দল অর্থাৎ সত্যিকারের সাম্যবাদী দলের বেদনাদায়ক অনুপস্থিতির কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই কাজটি সম্পন্ন হয় নি। বারবার এই সুযোগ আসা সত্ত্বেও তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি আপোষমুখী জাতীয় বুর্জোয়াদেরই সমর্থন ও শক্তিশালী করে গেছে। তাই মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদ বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বিকল্প হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। প্রথম দিকে যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল, তার কোনটাই সফল হতে পারে নি। যদিও তা গৌরবময় আত্মদানের মধ্য দিয়ে এদেশের যৌবনকে সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করে দিতে পেরেছিল। সেই অর্থে তার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

তবে একথা মনে রাখতে হবে, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বিপ্লবী অভ্যুত্থান ইতিপূর্বের বিভিন্ন অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা থেকে নানা দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এটা বিদ্রোহ নয়, তথাকথিত অস্ত্রাগার লুণ্ঠনও নয়, সম্পূর্ণ এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ছিল। তৎকালীন বিশাল ভারতবর্ষের এক প্রান্তে ছিল চট্টগ্রাম শহর। সেটা গ্রাম নয়, সাধারণ শহর নয়, বন্দর শহর। সেই বন্দর শহরকে দখল করে এদশের বুকে প্রথম বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা, সহজ ঘটনা ছিল না। এ ধরনের ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সেই যুগে এটাই প্রথম ঘটেছিল। পরে ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে 'তাম্রলিপ্ত সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র লড়াই সংগঠিত হয়েছিল এবং আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়েছিল, তারপর ১৯৪৫ সালে বোম্বেতে নৌ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানটি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত। পূর্ববর্তী বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে, বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে, এ দেশের এবং বিদেশের বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে মাস্টারদা সূর্য সেন দল গড়ে তুলেছিলেন। মাস্টারদা সূর্য সেনের চরিত্রে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সব্যসাচী তথা ডাক্তার চরিত্রের অনেক প্রভাব পাওয়া যায়। বোঝা যায় পূর্ববর্তী অন্যান্য বিপ্লবীদের ছাড়াও বিশেষভাবে সব্যসাচী চরিত্রটিকে অনুসরণ করে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এটা দলের সদস্যদের কাছেও স্পষ্ট ছিল এবং যার জন্য দলগত একটা আলোচনাই ছিল, 'পথের দাবী'র সব্যসাচী বা ডাক্তার বড় না মাস্টারদা বড়! এটা মাস্টারদার বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম নারী যোদ্ধা কল্পনা দত্তের লেখায় পাবেন। কল্পনা দত্ত এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল এই নিয়ে। উভয়ই একমত হয়েছিলেন

এবং তাঁদের চিন্তা অনুযায়ী মাস্টারদাই ছিলেন চরিত্রবৈশিষ্ট্যে বড়।

মাস্টারদার নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী চারটি দিন একটা শহরকে দখল করে রেখেছিল, ব্রিটিশ শাসনকে হটিয়ে দিয়েছিল এবং ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে দু'টি যুদ্ধে জয়লাভও করেছিল। মাস্টারদার বাহিনী প্রথম আক্রমণ করেই পরিকল্পিতভাবে অস্ত্রাগার দখল করল, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন ও রেলপথকে বিচ্ছিন্ন করল যাতে বাইরের সাথে যোগাযোগ না থাকে, সহজে ব্রিটিশ বাহিনী না ঢুকতে পারে। এভাবে এই অতর্কিত যুদ্ধে হ'ল জয়লাভ। তাঁরা জানতেন, বেশিক্ষণ এটা রক্ষা করা যাবে না, কিন্তু এই যুদ্ধ ও সাময়িক সাফল্য দেশের বিপ্লবী যুবশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে। এটাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এরপর ব্রিটিশের সামগ্রিক সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন বিপ্লবীরা। জালালাবাদ পাহাড়ে বিশাল ব্রিটিশ মিলিটারি বাহিনী এসেছিল, চতুর্দিক ঘিরে ইংরেজ সৈন্যরা বিপ্লবীদের আক্রমণ করল। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যরা পরাস্ত হয়। ফলে মুখোমুখি লড়াইয়ে, প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে দুবার জয়লাভ করা এবং চারটি বছর ধরে অর্থাৎ '৩০ থেকে '৩৪ সাল, তারপর আরও দুটি বছর ধরে চট্টগ্রাম শহরের দুপাশে গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মত দুঃসাধ্য সাধন করেছিল সূর্য সেন সৃষ্ট এই বিপ্লবী বাহিনী। চট্টগ্রাম শহরের আশপাশের মাত্র কুড়ি কিলোমিটার এলাকার মধ্যে তিনটি বছর ধরে আত্মগোপন করে ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের নানা স্থানের বাছাই করা মিলিটারি ও পুলিশ এবং বাছাই করা গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে শহর এবং গ্রাম ছেয়ে ফেলেছিল ব্রিটিশরা, গ্রামে গ্রামে মিলিটারি ক্যাম্প বসিয়েছিল, দিনের পর দিন শহরের পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামের পর গ্রামে তল্লাশি চালিয়েছিল। ছাত্র-যুবকদের আইডেনটিটি কার্ড চালু করেছিল, সর্বত্র সার্চ করেছিল, পিটুনি ট্যাক্স আদায় করেছিল। যেখানে সেখানে অত্যাচার, মারধোর, নির্যাতন, নারী নিগ্রহ সবই হয়েছে। মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেবার জন্য বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ধার্য করেছিল প্রশাসন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনটি বছর মাস্টারদাকে ধরতে পারেনি। প্রবল পরাক্রম ব্রিটিশ সরকারের এত শক্তি ও ব্যাপক অভিযান সত্ত্বেও মাস্টারদার সংগ্রামের প্রতি, মাস্টারদার চরিত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রবল আবেগ ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল! সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ দিয়েই মানুষ এটা সম্ভব করেছিল। এই অবিস্মরণীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপটেই মাস্টারদা সূর্য সেনকে বুঝতে হবে। তাঁর দুর্দমনীয় দেশপ্রেম, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অদম্য সাহস, অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য নির্ধারণের অসাধারণ দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসীম

ধৈর্য ও বিচক্ষণতা, যেকোন দুঃখ-কষ্ট-আঘাত-বেদনা সহ্য করার বিরল মানসিকতা, নির্দ্বিধায় প্রাণ দিতে পারার সদাপ্রস্তুত মন, জনগণ, গরিব মানুষ ও বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং গভীর মূল্যবোধ — এ সব দিয়েই তাঁকে বুঝতে হবে। এই অনন্যসাধারণ বিপ্লবী নেতাকে বাস্তবিকপক্ষে সেই সময় ধরা সম্ভবই হ'ত না, যদি একজন দেশদ্রোহী অর্থের লালসায় বিশ্বাসঘাতকতা না করত। দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, মুসলিম ঘরের মায়েরা পর্যন্ত তাঁকে বুক আগলে রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের কতটা আপন হতে পারায় এটা সম্ভব হয়েছিল ভাবলে অবাক হ'তে হয়। এখানেই এই মহান নায়কের অসামান্য চরিত্র, অশেষ গুণাবলী ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চরিত্রের এইসব দিক আমার কাছে, আপনাদের কাছে এবং আজ যাঁরা সমাজবিপ্লবের চিন্তা করেন ও দায়িত্ব কর্তব্য অনুভব করেন, তাঁদের সকলের কাছে শিক্ষণীয়। তাঁরা বুঝতে পারবেন, কেন কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার এঁদের চরিত্র থেকে আমাদের, আজকের দিনের সর্বহারা বিপ্লবীদের শিক্ষা নিতে বলেছেন। মাস্টারদার এসব গুণাবলীর কিছু কিছু দিক আজ আমি আপনাদের সামনে বলব। চট্টগ্রামের সেদিনের লড়াইয়ের কাহিনী, কোথায় কী হয়েছিল সেগুলো আপনারা বইতে পাবেন, তা নিয়ে আজ আমি সময় নিতে চাই না। শিক্ষণীয় দিকগুলি নিয়েই আমি সংক্ষেপে কিছু বলবার চেষ্টা করছি।

আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। সূর্য সেন নাম যেমন শুনেছি, মাস্টারদা নামও তেমনি শুনেছি। দুটো নামই শুনতাম। মাস্টারদা বেশি শুনতাম, সূর্য সেন নামটা কম। প্রথম দিকে দুজন আলাদা ব্যক্তি ভাবতাম। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র এ নিয়ে আলোচনা হত। পরে বুঝেছি, একই ব্যক্তি দুই নামে পরিচিত ছিলেন। তখন ভগৎ সিং নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না। আমাদের ছোটবেলায় ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই নামগুলি জানতাম। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন বা অনুগামী ছিলেন তাঁদেরও কিছু বক্তব্য আমি পড়েছি, আমাকে অভিভূত করেছে। সেগুলি থেকে বোঝা যায় অন্যান্য বিপ্লবী যাঁরা তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন তাঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি অনেক দিক থেকে তাঁদের তুলনায় নিজেকে আরও পরিণত করেছিলেন।

মাস্টারদা সূর্য সেন বারবারই বলে গেছেন, 'আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করছি। চট্টগ্রামের যে সরকার ঘোষণা করলাম, আমরা জানি এই সরকার টিকবে না, আমরা জানি, আমরা এই যুদ্ধে পরাস্ত হব'। কিন্তু এটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে,পরবর্তীকালে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করবে। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও কী গভীর প্রত্যয়ে মাস্টারদা বলেছিলেন, 'Do or die' নয়,

'Do and die'। আমরা লড়ব, আমরা মরব, আমরা মৃত্যু দিয়ে, মৃত্যুকে বরণ করে এদেশকে জাগিয়ে দিয়ে যাব। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর একটার পর একটা আঘাত করছি, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও অত্যাচারের শাসনযন্ত্রকে আঘাত করছি। এই যে আঘাতটা করছি, এটাই আমাদের সাফল্য। এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বৃহৎ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ঘটবে। তিনি বলেছিলেন, 'চট্টগ্রামের সসীম ক্ষেত্রে সংগ্রামের যে তরঙ্গ উঠবে, তা ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে আছড়ে পড়বে, এই আমাদের স্বপ্ন, এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমরা তার পথ পরিষ্কার করে যাচ্ছি।' একথা এই সংগ্রামে যাঁরা সেনাপতি ছিলেন, যাঁরা সৈনিক ছিলেন, তাঁদের তিনি বারবার বলতেন। বলতেন, 'আমাদের এই ধরনের কর্মসূচী মৃত্যু-কর্মসূচী। তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর জন্য যারা প্রস্তুত একমাত্র তারাই দলে আসতে পারে'। ফলে, দলে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখে নিতেন। সেই সংখ্যা কম হোক, ক্ষতি নেই। কোন্‌টা হীরে কোন্‌টা কাঁচ যাচাই করে নিতেন তিনি। এখনও সেই লড়াইয়ের যোদ্ধা এক বৃদ্ধ বেঁচে আছেন, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে, জালালাবাদের লড়াইতে যিনি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। গুলিবিদ্ধ হয়েও প্রাণে বেঁচে যেতে পেরেছিলেন। এখন তাঁর বয়স একশত এক বছর। তিনি হ'লেন শ্রদ্ধেয় বিনোদ বিহারী চৌধুরী। তাঁর সাথে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। একবার বারাসাতের একটি সভায়। আর একবার বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। তাঁকে দেখে বোঝা যায় মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রভাব আজও এঁদের মধ্যে কীভাবে জ্বলজ্বল করছে। তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন। যখন দলে যুক্ত হতে চাইলেন, মাস্টারদা তাঁর পরীক্ষা নিলেন। ঘোর অমাবস্যায় এক শ্মশানে মাঝ রাতে, যেখানে সচরাচর কোনও মানুষ যেতে চায় না, সেখানে মাস্টারদা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলেন পিঠের উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মাস্টারদা। আসলে মাস্টারদা তার আগ্রহ ও ধৈর্যের পরীক্ষা করছিলেন। তারপর বিনোদবাবুকে অনেক বোঝালেন। বললেন, 'তুমি ভাল ছাত্র, ভাল রেজাল্ট করবে, তোমার অনেক নাম হবে, তুমি উচ্চপদে চাকুরি পাবে, এই জীবন-মরণের লড়াইয়ে আসবে কেন?' বিনোদবাবু দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, 'না আমি ঐসব চাই না, আমি লড়ব, আমি দেশের জন্য প্রাণ দেব।' আরও বললেন, 'আপনি যদি আপনার দলে আমাকে যুক্ত হতে অনুমতি না দেন, তাহলে দেশে আরো বিপ্লবী দল আছে, আমি সেগুলোতে চলে যাব।' মাস্টারদা ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন এসেছেন গরিব বাড়ি থেকে। তাঁকে বললেন, 'তুমি যদি প্রাণ দাও তাহলে তোমার বাবা-মাকে দেখবে কে?' অনেক

বুঝিয়ে, কথা বলে, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন, সে খুব শক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রীতিলতাকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমার কাছে পরিবার আর দেশ, কোনটা বড়?' প্রীতিলতাও নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'পরিবারের প্রতি আমার যথেষ্ট টান আছে, কিন্তু দেশের ডাক এলে সেটাই প্রাধান্য পাবে।' এরকম করে প্রত্যেককেই নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর তারপর তৃতীয় স্তর, এভাবে পরীক্ষা করে করে তারপর মূল সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করতেন এবং এঁদের বইপত্র পড়তে দিতেন। তার মধ্যে 'পথের দাবী' অবশ্য পাঠ্য ছিল। তাছাড়া নানা বই দিতেন, আনন্দমঠও পড়াতেন। নানা বিপ্লবীদের জীবনকাহিনী পড়িয়েছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংস্পর্শে তিনি আসেন নি। ফলে শ্রেণীসংগ্রাম ও পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চিন্তাও আসেনি। ফলে শ্রেণী চেতনা, সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পাননি। তবে সোভিয়েট বিপ্লবকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'নতুন সভ্যতার সূর্যোদয়'। লেনিনের জীবনী তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছিল, একথা শ্রদ্ধেয় বিনোদবাবুর কথাতে পাওয়া যায়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক বলব। তখনকার দিনে বিপ্লবীরা অস্ত্র কেনার জন্য টাকা সংগ্রহ করত কখনও কখনও ডাকাতি করে, এটাকে বলা হ'ত স্বদেশি ডাকাতি। মাস্টারদা এই পথ বর্জন করলেন। বললেন, 'যাঁরা স্বদেশি, যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দেবে, তাঁরা অন্যের বাড়িতে ডাকাতি করবে কেন? তাঁরা নিজের ঘর থেকে আনবে, সেটাই তো তাঁদের আত্মত্যাগ। নিজের বাড়ি থেকে টাকা, পয়সা, অলংকার যা কিছু পারে সংগ্রহ করে আনবে এবং অ্যাকশনে যাওয়ার গৌরবময় সুযোগ তাঁরাই পাবে, যাঁরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে'। এই যে নিজের ঘর থেকে আনা, এই আত্মত্যাগ, এই ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, তার মধ্য দিয়ে দলের তহবিল পূরণ করা — এটা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারণা তিনি নিয়ে এলেন। এরকম ঘটনাও আছে, একজন অত্যন্ত গরিব ছেলে, তাঁর বাবা ঘরামির কাজ করেন। মাস্টারদা সবাইকে নিজের ঘর থেকে আনতে বলেছেন, কিন্তু ঘর থেকে আনতে পারে এমন কিছু তাঁর নেই। তাঁর মায়ের ভাঙা দু'গাছা রূপোর অলংকার সে নিয়ে এল, কাঁদছে, তাঁর দেওয়ার মত আর কিছু নেই। মাস্টারদা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'অর্থমূল্যে তোমার দান অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তোমার এই হৃদয়ই অমূল্য। তুমিই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে থাকবে'।

মাস্টারদাকে বাইরে সকলেই জানত জাতীয় কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান সংগঠক হিসেবে। যাতে বিপ্লবের প্রস্তুতি বাইরের লোক বুঝতে না পারে এজন্য তিনি বহু

ক্লাব, ব্যায়ামাগার, কুস্তির আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে ছাত্র যুবকরা ট্রেনিং নিত। বাইরের থেকে অনেকে মনে করত, সরকারি লোকজনও মনে করত, ছেলেরা খেলাধূলা করছে, ব্যায়াম করছে, কুস্তি করছে। এভাবে অনেক ছাত্র যুবক যুক্ত হয়েছে। সেখান থেকে তিনি বাছাই করতেন। নানা জায়গায় ব্যায়াম, কুস্তির প্রদর্শনী করাতেন, যাতে পুলিশ অন্যরকম না ভাবতে পারে। আবার ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, নারী সংগঠন এগুলো গড়বার জন্য আলাদা দায়িত্ব দিয়েছেন। আরেক দিকে গোপনে চলত অস্ত্র সংগ্রহ, অস্ত্রের ট্রেনিং। দলে একদল যুদ্ধ করবে, একদল প্রচার চালাবে, একদল অর্থ সংগ্রহ করবে, আরেক দল শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখবে — এভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। আর শহর শুধু নয়, শহরের চতুর্দিকে গ্রামগুলিতেও বহু সেবামূলক কাজ করেছেন, যাতে কর্মীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং দেশের মানুষের মধ্যে তাঁদের প্রতি, তাঁদের কাজের প্রতি একটা সমর্থন গড়ে ওঠে। এভাবে মাস্টারদা প্রথমদিকে একজন দেশপ্রেমী আদর্শ শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলেন। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতি আকর্ষণ থেকেই ছাত্র যুবকরা ঘনিষ্ঠ হতো। মাস্টারদার কাছ থেকেই বৃহত্তর সমাজকে, দেশকে জানতে পারতো, উদ্বুদ্ধ হতো দেশের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণে। তিনি কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার আগে, কাউকে যুদ্ধে পাঠানোর আগে পরীক্ষা করে নিতেন সে পারবে কিনা। সেই কর্মীর সাহস, দক্ষতা, যোগ্যতা এসব বারবার যাচাই করে নিতেন। এ সব ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আরেকটা কথা বলতে চাই। সে সময় এদেশে যে সব বিপ্লবী গ্রুপ ছিল, তাদের মধ্যে বৈরিতা ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল, মাঝে মাঝে সংঘর্ষও হতো। আবার সকলে পুলিশের বিরুদ্ধে একত্রেও দাঁড়াত। সূর্য সেন এসব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি 'যুগান্তর' গোষ্ঠীতে যুক্ত ছিলেন। যুগান্তরে গীতা স্পর্শ করে অঙ্গীকার ইত্যাদি ছিল। কিন্তু তিনি নিজে এইসব প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এই সব আচার অনুষ্ঠান যে দেশের মুসলিম সমাজকে স্বাধীনতার সংগ্রামে যুক্ত করার পথে অন্তরায়, তা তিনি বুঝতেন। তা সত্ত্বেও এসব যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের সাথে তিনি বিরোধ সৃষ্টি করেন নি। তিনি সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে এঁরা সকলেই একত্র হোক, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠুক। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে বাংলার কংগ্রেসে সুভাষ বোস না যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, নেতৃত্বে কে আসবেন, এই নিয়ে বাংলার কংগ্রেস ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে রীতিমত বিরোধ সংঘর্ষও হয়েছে। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের মানুষ ছিলেন। কিন্তু

চট্টগ্রামের মানুষ হলেও মাস্টারদা ছিলেন সুভাষ বোসের সমর্থক। তাঁর কাছে যোগ্যতাই ছিল বিচারের মাপকাঠি, জেলাগত কোন সেন্টিমেন্ট ছিল না। সুভাষ বোসের সমর্থক হিসাবেই তিনি চট্টগ্রামে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এতে বিরোধীপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং মাস্টারদাকে আঘাত পর্যন্ত করে। তাঁর রক্ত ঝরে, তাঁর দলের একজন মারাও যান। এতে মাস্টারদার সহকর্মীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়। মাস্টারদা তখন দাঁড়াতে পারছেন না এমন রক্ত ঝরছিল, সে অবস্থাতেও কোনরকমে তিনি এগিয়ে এলেন এবং দুজনের কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে বললেন — 'এভাবে নিজেদের শক্তিক্ষয় কোরো না, তাতে আমাদের মূল শত্রুর সাহায্য হবে। আমার সামান্য রক্ত দেখে তোমরা এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? মূল শত্রু আমাদের আরও রক্ত ঝরাবে। সেই মূল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিকে তাকিয়েই আত্মকলহে শক্তিক্ষয় হ'তে দেওয়া যায় না'। এদেশের বুকে সেদিন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপের অন্য কারও মধ্যে এই ধরনের চিন্তা বিশেষ পাওয়া যায় না। এই যে জাজমেন্টটা সে মুহূর্তে করেছিলেন, সেটা কী বড় মাপের ছিল, একবার ভেবে দেখুন। তিনি আক্রান্ত, তাঁর রক্ত ঝরছে, একজন সহকর্মী নিহত এবং অন্যান্য সহকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পাল্টা আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, অথচ তিনি বলছেন মূল শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আঘাত না করে এখানে শক্তিক্ষয় করা অন্যায়। নিজে এভাবে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টকে স্থান দেন নি। কারণ দেশের মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই তাঁর ছিল না। আত্মকলহের দ্বন্দ্বসংঘাতে নিজেদের শক্তি নষ্ট করতে চান নি।

সে যুগে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা, এমনকী বিপ্লবী দলের মধ্যেও বহু নেতা, কর্মীদের সাথে একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন। বিপ্লবী দলে নেতাদের কর্মীরা দেবতার মতো মানতেন। তাঁদের নির্দেশে কাজ করতেন। মতপার্থক্য ব্যক্ত করা, প্রশ্ন করা, তর্ক করার কোন সুযোগই ছিল না। বরং বিনা প্রশ্নে নির্দেশ মানা দলে অন্তর্ভুক্তির শর্ত ছিল। মাস্টারদা এখানে ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা ছিল, কিন্তু সমস্ত নেতা-কর্মীদের সাথে তিনি বন্ধুর মত মিশতেন, সহজ সরল ভাবে মিশতেন, একেবারে আপন হয়ে যেতেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। এটা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এমনকী তিনি কর্মীদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছেন, গল্প করছেন, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছেন, গান শুনছেন, তাস খেলছেন — এসব পরিচিত দৃশ্য ছিল। তিনি বলতেন, 'বিপ্লবীদের মনকে সব সময় প্রফুল্ল রাখতে হয়'। আবার একজন স্কুলের ছাত্র,

বিপ্লবী আন্দোলনের সৈনিক, সেও তার কথা খোলামনে মাস্টারদার কাছে রাখছে, যে কেউ মতপার্থক্য হলেও খোলামনে রাখছে, দলের মধ্যে এই পরিবেশ ছিল। মাস্টারদার বিশিষ্ট কয়েকজন সহকর্মী বলেছেন — 'মাস্টারদা কখনও নির্দেশ দিতেন না, তাঁর ইচ্ছা কারো উপর চাপিয়ে দিতেন না, কারণ মাস্টারদা জানতেন নির্দেশ দিলে, চাপিয়ে দিলে মন থেকে কাজটা হবে না। মাস্টারদা যুক্তি দিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। যতক্ষণ অপরে বুঝতে পারছে না, ধৈর্যের সাথে বোঝাতেন। বিরুদ্ধ মতকে অবজ্ঞা করতেন না, শুনতেন ধৈর্যের সাথে, স্বল্প কথায় তাঁর শক্তিশালী যুক্তির দ্বারা অপরকে জয় করতেন'। এইভাবে তিনি সকলকে জয় করেছিলেন। সেই যুগে অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিবেশ অভাবনীয় ছিল। কখনও নেতা হিসাবে তাঁর অহংকার, কর্তৃত্বসুলভ আচরণ, দম্ভ, এসব বিন্দুমাত্র দেখা যায় নি। বরং মাস্টারদা বলতেন, 'আমার যাঁরা সহকর্মী তাঁদের সকলের নানা দিক থেকে অনেক গুণ আছে। ওঁরা কেন যে আমাকে নেতা ব'লে মানে, এতে আমি বিস্মিত, অভিভূত। ওঁরা যে কী আমার মধ্যে দেখেছে বা পেয়েছে আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু আমি ওঁদের গুণে মুগ্ধ, ওঁরাই আমাকে বড় করেছে'। মাস্টারদার কাছে কল্পনা দত্ত তাঁর জীবন কাহিনী শুনতে গেছেন। গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং এবং আরও অনেকের কাহিনী মাস্টারদা বলেছেন এবং তারপর বলেছেন, আমার নিজের কাহিনী তেমন কিছু নেই। এঁরাই আমাকে বড় করেছেন। এতটুকু অহংকার নেই, আত্মপ্রচার নেই। কত বড় মানুষ হলে সহকর্মীদের গুণের এভাবে স্বীকৃতি দিতে পারা সম্ভব! আর এই ধরনের মহৎ গুণাবলীর জন্যই মাস্টারদা সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন, সকলের অন্তর জয় করা নেতা হয়েছিলেন। মাস্টারদা সবসময় অন্যদের অসুবিধার কথা ভাবতেন, কিন্তু নিজের অসুবিধার কথা বলে অন্যদের কখনও ব্যস্ত হতে দিতেন না। তাঁর নিজের কোনও চাহিদা ছিল না। তিনি কংগ্রেস অফিসে থাকতেন। ১৮ই এপ্রিল '৩০ সাল ছিল চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের দিন। ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত কংগ্রেস অফিসে থেকে নিজের জন্য টিউশন করেছেন। গরিব ছাত্রছাত্রীদেরও তিনি সাহায্য করতেন। কখনও কখনও না খেয়ে থেকেছেন, সেকথা কাউকে জানতেও দিতেন না। কংগ্রেস ফাণ্ড থেকে একটি পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করতেন না। অভ্যুত্থানের আগে কংগ্রেস অফিস ছাড়ার সময় পাই-পয়সা হিসাব লিখিতভাবে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান।

একবার দলের একজন কিশোর কর্মী, যে পরে জালালাবাদ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, লোকনাথ বলের ছোট ভাই টেগরা, মাস্টারদার কাছে পয়সা চাইলেন, কারণ অফিসের সামনে একজন ভিখারি চাইছে, তাকে কিছু দিতে হবে।

ভিতরে মাস্টারদা বই পড়ছেন। মাস্টারদা বললেন, 'পয়সা নেই'। টেগরা তখন হাঁড়িতে চাল খুঁজছিলেন, কারণ মাস্টারদা রান্না করে খেতেন। দেখলেন চাল নেই, হাঁড়ি ইত্যাদি একেবারে শুকনো, উনুনও জ্বলেনি। তখন তিনি মাস্টারদাকে বললেন, 'আপনি কিছু খান নি?' মাস্টারদা নিরুত্তর। পাশে গণেশ ঘোষের দোকান ছিল। টেগরা ছুটে গিয়ে তাঁকে খুব বকলেন, 'মাস্টারদা না খেয়ে আছেন, আর আপনারা কোনও খোঁজ নেন না'। গণেশ ঘোষ ছুটে এসেছেন। এসে অভিমানে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তো আপনার কেউ নয়। আপনি দু'দিন কিছু খাননি, আমাদের একবার বললেন না?' মাস্টারদা একটু হেসে বললেন, 'না, খেয়েছি, চা খেয়েছি।' এমনই আরও কত দিন গিয়েছে! মাস্টারদার ডাকে যে এত মানুষ টাকা পয়সা, নিজের ভবিষ্যৎ, এমনকী জীবন পর্যন্ত সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন — তা এমনি এমনি ঘটেনি। নিজের অসাধারণ চরিত্রগুণেই তিনি সকলের বুকে স্থান করে নিয়েছিলেন। অনুগামীরা লিখছেন, 'তাঁর একটা ইচ্ছা, তাঁর একটা নির্দেশ, তাঁর একটা ইঙ্গিতে যেকোন মুহূর্তে আমরা সকলেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম।' কিন্তু কিসের টানে এ জিনিস সম্ভব? অসাধারণ বিপ্লবী চরিত্র তো! এরূপ চরিত্র সবযুগেই বিরল! আমি এসব আলোচনা করছি এই কারণেই যে, আজকের যুগে এগুলো আমাদের কত শিক্ষণীয় !

অনন্ত সিং একটা দুর্বল মুহূর্তে কলকাতায় ধরা দিলেন। তিনি গ্লানিতে ছটফট করছেন। একজন কর্মী গোপনে দেখা করে এসে মাস্টারদাকে বললেন, 'আমি অনন্তদাকে পটাশিয়াম সায়ানাইড দিতে যাচ্ছি।' চমকে উঠে উদ্বিগ্ন মাস্টারদা প্রশ্ন করলেন, 'কেন?' কর্মীটি বললেন, 'তিনি আর জীবন রাখতে চান না।' মাস্টারদা বললেন, 'সে কি? সে একটি দুর্বল মুহূর্তে এ কাজ করে ফেলেছে, তার জন্য তাঁর মতো একটা জীবন চলে যাবে? তুমি ওকে বোঝাও, আমার নির্দেশ ও যেন কিছুতেই এ কাজ না করে, ওর জন্য একটা বড় কাজ আছে।' কোর্টের দোরগোড়ায় দেখা করে কর্মীটি এ কথা জানাল। অনন্ত সিং দুঃখ করে বললেন, 'মাস্টারদা কি আমাকে শান্তিতে মরতেও দেবেন না?' মাস্টারদা সাংকেতিক চিহ্নে লিখে পাঠালেন যে, 'একটা বড় অ্যাকশন আছে, তোমাকে আমার প্রয়োজন, এটাই আমার নির্দেশ।' এই যে একটা অ্যাপ্রোচ — দুর্বলতা আর বিশ্বাসঘাতকতা এক নয়, এটা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সব্যসাচীরই অ্যাপ্রোচ দুর্বলচিত্ত অপূর্বর ক্ষেত্রে। দলের কিছু কিশোর কর্মী ধরা পড়ে গেছে, পুলিশের প্রচণ্ড মার খেয়েছে, পুলিশ নখ তুলে দিয়েছে, গরম ছ্যাঁকা দিয়েছে টেনে ধরে। এই চরম অত্যাচারের মধ্যে পড়ে ওরা কিছু গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে। এ

খবর আসার পর অন্য কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এঁদেরই মধ্যে একজন বললেন, 'আমি একটা কিছু করে জেলে যাব। নরেন গোঁসাইকে যেভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, আমি এদেরকেও এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেব।' শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় হওয়ার মুখে। মাস্টারদা সব শুনে বললেন, 'এটা একেবারেই ঠিক নয়, ওদের বয়স খুবই কম, অল্পদিন হল এসেছে। ওরা রোমান্টিক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এসবের মধ্যে যে এত কষ্ট, এত অসুবিধা, এত অত্যাচার তারা ভাবতেও পারেনি। আমরাই তো তাদের প্রস্তুত করতে পারিনি। তোমরা মূল শত্রুর কথা ভাব। আজকে শুধু এদের কথা ভাবছ কেন? হতাশ হচ্ছো কেন? জালালাবাদ পাহাড়ে যে বারো জন চোদ্দ, পনের, বিশ বছরের কিশোর প্রাণ দিয়ে গেছে, তাদের নাম তো রক্তে লেখা হয়ে থাকবে। সেটা তো মুছতে পারবে না ইতিহাস থেকে। সেই বীরদের স্মরণ করো। যারা দুর্বল, পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, তাদের শাস্তি দিতে যেও না।' এর পরেই মাস্টারদা বলেছিলেন, 'তোমাদের আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু সেদিন হতে পারত। যারা বেঁচে গেছি তাদের সংগ্রামের পথে চলতে হবে। যারা পারবে না, তারা ফিরে যাও। কিন্তু আমি এই চট্টগ্রামের পাহাড়ী মাটিতেই আমার শেষ শয্যা পাতব।' এখানেও 'পথের দাবী'র অপূর্ব সম্পর্কে সব্যসাচীর অ্যাপ্রোচের সুস্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়। অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনে সেদিন কিন্তু এ ধরনের বিচার পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ঐসব সংগঠনে মৃতুদণ্ড হয়ত অবধারিত ছিল। কিন্তু মাস্টারদা সেদিন অপরিণত ও দুর্বলচিত্তজনিত কাজ এবং বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন।

মাস্টারদা সেই যুগের প্রভাবে ধর্মীয় চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি এ কথা ঠিক। এ বিষয়ে সব্যসাচীর চিন্তার প্রকাশ তাঁর মধ্যে ঘটতে পারেনি, সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। শরৎবাবুর সব্যসাচী বলেছিলেন, "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এত বড় শত্রু আর নাই।" এই চিন্তা সে যুগে ভগৎ সিং ছাড়া অন্য কোনও বিপ্লবীর মধ্যে তেমন করে প্রতিফলিত হয়েছে বলে জানা যায় না। কিন্তু ধর্মীয় চিন্তা থেকে মুক্ত হতে না পারলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রায় মাস্টারদা ছিলেন সেকুলার। অন্যান্যদের মতো গীতা হাতে নিয়ে শপথ নেওয়া, কালী প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেওয়া, এসব তাঁর দলে ছিল না। তাঁর দলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই অবারিত দ্বার ছিল। মাস্টারদা যে তিন বছর আত্মগোপন করে ছিলেন, তার বেশির ভাগ সময়টা ছিলেন গরিব মুসলমান চাষীদের পরিবারে। মাস্টারদাকে কেউ গুপ্ত খবর দিতে গিয়ে দেখেছে, এক মুসলমান বৃদ্ধা নারী চৌকিতে শুয়ে আছেন, তার খাটের তলায় মাটির গর্তে লুকিয়ে আছেন মাস্টারদা। কী অগাধ ভালবাসা ও

বিশ্বাস তাঁর প্রতি ছিল এঁদের! আত্মগোপনের সময়ে এইভাবে বহু জায়গায় তিনি ছিলেন। শরীর দুর্বল হলেও বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁকে বারবার বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাঁর সহকর্মী বা অনুগামীরা ঠাট্টা করতেন , 'আপনার এরকম শরীর, আপনি কী করবেন? আপনি আমাদের মত দৌড়াতে পারবেন না, ছুটতে পারবেন না, আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না।' এটা তাঁরা ঠাট্টা করেই বলতেন। কারণ তাঁরা জানতেন শরীরের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে মাস্টারদার করার ক্ষমতা কী বিরাট ছিল! বহুবার গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেছেন, ঠিক সময়ে বের হয়ে চলে গেছেন। শেষবারও ধরা পড়তেন না, যদি বিশ্বাসঘাতকতা না হত। ব্রিটিশ পুলিশ ও গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে সূর্য সেন কখনও কখনও টোঙা মাথায় চাষী হয়ে, কখনও মাঝির বেশে নৌকার বৈঠা নিয়ে, কখনও জাল নিয়ে জেলে সেজে, কখনও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হয়ে, আবার কখনও বোরখা পরা বা শাড়ি পরা মহিলা সেজে সরে গেছেন। কখনও অন্তঃপুরে বসে আছেন একেবারে মহিলাদের মধ্যে। ব্রিটিশ পুলিশের সাধ্য কী খুঁজে বের করতে পারে! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হদিশ পায় নি। এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সকলের মধ্যে একেবারে আপন হয়ে থাকতেন। কত বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে গ্রামের মানুষ! কারণ, সূর্য সেনকে আশ্রয় দেওয়া মানে একেবারে সরকারি কোপে শেষ হয়ে যাওয়া। তবুও কীভাবে বুকে ধরে সূর্য সেনকে তারা রক্ষা করেছে। কতটা জনসমর্থন থাকলে, জনগণের কত বুকঢালা ভালবাসা থাকলে এটা সম্ভব! ব্রিটিশ পুলিশ সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, কত টাকার প্রলোভন দিচ্ছে, এ সব জেনেও চট্টগ্রাম তিনি ছাড়েননি। অনেকেই বারবার চট্টগ্রাম ছাড়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, নেতাজীর বড় ভাই শরৎ বসুও চিঠি পাঠিয়েছেন, 'আমি টাকা পাঠিয়েছি। তুমি সরে যাও।' তিনি উত্তর দিচ্ছেন, 'আমি এখানে থেকেই সংগঠন করব।' ঐ রকম দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রামের মধ্যেই থেকেছেন। এইভাবে গণভিত্তি স্থাপন সেই যুগে অন্য বিপ্লবীরা করতে পারেননি। এই ক্ষেত্রেও মাস্টারদা অতুলনীয় ছিলেন।

তিনি প্রীতিলতা, কল্পনা এবং আরও কিছু অসাধারণ নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। নারী সদস্য নিয়ে প্রথমদিকে দলের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল, এজন্য একজন তাঁর দল ছেড়েও দিয়েছিলেন। সে যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েরা থাকবে কিনা, তা নিয়ে মতভেদ ছিল। অনেকে বলতেন, মেয়েরা বড় জোর ঘরে চরকা কাটবে, মিটিং মিছিলে যাওয়া তাঁদের চলে না, বিপ্লবের পথে যাওয়ার কথা তো ভাবাই চলে না। এই ছিল সেইযুগে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তায় আচ্ছন্ন সমাজের বদ্ধমূল ধারণা। এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন শরৎচন্দ্র। তিনি বললেন, 'যে স্বরাজের

আন্দোলনে নারীর সহযোগিতা নেই, সংযোগ নেই, নারীকে শুধু অন্তঃপুরে রাখা হয়েছে চরকা কাটার জন্য — সে স্বরাজ দেশে আসতে পারে না। আসলেও সেই স্বরাজ টিকবে না।' যুবকদের তিনি বললেন, 'পুরুষের পাশাপাশি স্বরাজ সাধনায় নারীকেও চাই। আমি জানি এটা করতে গেলে নিন্দুকেরা কুৎসা রটাবেই। নিন্দুকেরা কুৎসা রটাক, তার জন্য কাজ থামালে চলবে না।' মাস্টারদা এই আহ্বানকে কাজে রূপান্তরিত করেছিলেন। বিপ্লবীদের মধ্যে নারীদের কাজের প্রশ্নে বড়জোর গোপন চিঠি পাঠানো, শাড়ির মধ্যে পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির বাইরে কোনও কাজের ভাবনা ছিল না সেদিন। সূর্য সেনেরও প্রথমদিকে, '৩০ সালের আগে পর্যন্ত অনেকটা এমন ভাবনাই ছিল। পরবর্তীকালে তাঁরও চিন্তার পরিবর্তন ঘটে। দলের মেয়েরাও সরাসরি সশস্ত্র লড়াইয়ে যাবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানাতে থাকে। সে অর্থে প্রীতিলতা তাঁর সার্থক সৃষ্টি। এই প্রীতিলতাকে দিয়ে তিনি লড়াইটা করালেন এবং সেই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে প্রীতিলতা আত্মদান করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের সামনে বিপ্লবী হিসাবে নারী চরিত্রকে তুলে ধরা। এর আগে সমস্ত লড়াইয়ে পুরুষরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রীতিলতাকে সূর্য সেন নেতৃত্ব দিতে বললে প্রীতিলতা বলেছিলেন, 'আমি কেন নেতৃত্ব দেব? ছেলেরা আছে।' মাস্টারদা বললেন, 'না, তোমাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। তুমি পারবে।' গোটা দেশের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে, শুধু পুরুষরাই নয়, নারীরাও পারে। প্রীতিলতার আত্মদানের সময় তাঁর মাত্র একুশ বছর বয়স ছিল, গরিব পরিবারে সদ্য স্কুলের শিক্ষকতা পেয়েছেন, দেশের ডাকে জীবন উৎসর্গ করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেননি। প্রীতিলতা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মাকে দেওয়া একটা চিঠি আছে, যা পড়লে আপনাদের, আমাদের সকলের চোখে জল এনে দেবে। যাওয়ার সময় মা বলেছিলেন, 'খেয়ে যা।' কিন্তু তারও সময় ছিল না। মা জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলেন, ছিটকে বেরিয়ে এসেছেন প্রীতিলতা। মা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি যে, তাঁর আদরের সন্তান মৃত্যুযজ্ঞে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেছেন। আত্মাহুতির আগের দিন প্রীতিলতা মায়ের উদ্দেশে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মর্মস্পর্শী আবেদন আজও হৃদয়বান বিবেককে নাড়া দেবে। তিনি লিখছেন, '... মাগো, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা। তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি

কেবলই কাঁদবে?' এ আবেদন যেন সকল দেশের মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গীকৃত শহীদদের শোকার্ত জননীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। একুশ বছরের একজন নারী লিখছেন এ কথা, ভাবতে পারেন! সেই যুগে কোনও রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির, পলিটিক্যাল ক্লাস, এত তত্ত্ব আলোচনা, এসব কিছুই ছিল না। অথচ এই ধরনের নারী চরিত্র এসেছিল। যুগটাই ছিল তাই। সমাজে মূল্যবোধ, মনুষ্যত্বের বিরাট প্রভাব ছিল। আত্মদানের পূর্বমুহূর্তে এদেশের স্বদেশি আন্দোলনে বিপ্লবী ধারার নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করে এই বিপ্লবী নারী লিখেছেন, 'স্বদেশবাসীদের নিকট আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তাঁহারা অনেকেই হয়তো ভাবিবেন, একজন ভারতীয় নারী স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়া নরহত্যারূপ বীভৎস কার্যে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে! আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই, স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে তারতম্য করা হয় কেন? ... সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যখন নারী-পুরুষ পাশাপাশি কার্য করিয়াছে, তখন বিপ্লবী আন্দোলনেই বা কেন পুরুষের সঙ্গে নারীগণ একযোগে কাজ করিতে পারিবে না? পদ্ধতি ভিন্ন, না নারীজাতি অযোগ্য বলিয়া? সশস্ত্র ক্ষেত্রে নারীর যোগদান তো নূতন নহে। বিভিন্ন দেশে যেসব সার্থক বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে নারীগণ শতে শতে যোগ দিয়াছে। ভারতবর্ষেই বা ইহা কেন নিন্দার্হ হইবে? যোগ্যতা যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীকে সর্বদা পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য বিবেচনা করা কি অসঙ্গত নহে? এই মিথ্যা ধারণা বর্জন করিবার সময় আসিয়াছে।' তারপরেই আশা ব্যক্ত করে লিখছেন, 'আমার বিশ্বাস, আমার ভগিনীরা দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া হাজারে হাজারে আসিয়া বিপ্লবী দলে যোগ দিবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার। মাস্টারদা কিন্তু প্রথম দিকে চাননি যে প্রীতিলতা লড়াই করতে গিয়ে আত্মদান করুক। কিন্তু প্রীতিলতাই মাস্টারদার কাছে কয়েকবার আবেদন করে বোঝান যে, তিনি আত্মদান করলে দেশের সামনে দৃষ্টান্ত রাখা যাবে। নারীরাও বিপ্লবী যুদ্ধে পুরুষের মতই প্রাণ দিতে পারে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে দেশের নারীরাও অনুপ্রাণিত হ'য়ে হাজারে হাজারে বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেবেন — এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি মাস্টারদার অনুমতি আদায় করেন। আজ একবার ভাবুন, মাস্টারদার সংগঠনের এই অসামান্যা নারী চরিত্র সেদিন যে অবিস্মরণীয় আবেদন রেখে, যে স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মদান করেছিলেন, সেদিন এবং আজও এই দেশ, এই দেশের পুরুষজাতি ও নারীজাতি তার মূল্য কতটুকু দিতে পেরেছে? আজও তো দেশের কাজে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিপ্লবী সংগ্রামে নারীরা অংশ নিলে কত প্রশ্ন, কত বিরুদ্ধতা, কত সমালোচনার

ঝড় ওঠে! ভাবুন, প্রীতিলতা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। পাশ করে সদ্য মাস্টারি নিয়েছিলেন, কাজটা করলে পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আসত, মা-বাবার মুখে হাসি ফুটত, মা-বাবাকে তো তিনি গভীরভাবেই ভালোবাসতেন। কিন্তু দেশের, সমাজের অসংখ্য মানুষের কান্নার চেয়ে বাবা-মায়ের কান্না তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে নি। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে একবারও ভাবেন নি, তিনি চলে গেলে গরিব পরিবার চলবে কী করে, অসহায় বাবা-মা, ছোট ভাই-বোনকে কে দেখবে!

মাস্টারদার দলে মুসলিম ঘরের ছেলেরাও যোগ দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর দলে ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসাবে ছিল, রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনে, মেলামেশায়, আচার আচরণে এটা কখনও বাধা হিসাবে কাজ করেনি। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বহু মুসলিম পুরুষ ও নারীর অন্তর তিনি জয় করেছিলেন, যাঁরা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন, নারী হিসাবে প্রীতিলতার মতো মীর আহমেদ নামে একজন মুসলিম যুবককে দিয়েও বৈপ্লবিক কর্তব্য পালনের ইতিহাস সৃষ্টি করাবেন। সেই যুবক সানন্দে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন জেলে থাকাকালীন অত্যাচারী ইংরেজ জেলারকে প্রাণদণ্ডদানের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে নি। মীর আহমেদ তখন কারাগারে, তাঁর বাড়িতেই মাস্টারদা ক্ষীরোদবাবু পরিচয় দিয়ে আরও কয়েকজন সহকর্মীসহ কয়েকদিন আত্মগোপন করেছিলেন। মীর আহমেদের মা মাস্টারদাকে চিনতেন না, একদিন রাতে সকলকে তালের পিঠে তৈরি করে খাওয়াচ্ছিলেন, সকলেই আনন্দের সাথে খাচ্ছিলেন। বৃদ্ধা আপশোস করে বলছিলেন, 'তোমাদের মাস্টারদাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে বাবা, তাঁকে খাওয়াতে পারলাম না।' ক্ষীরোদবাবু হাসিমুখে বললেন, 'আরও কয়েকটি পিঠে যদি দাও খালা (মাসি), তবে দেখাতে পারি। তবে জানো তো, তাঁর মাথার উপরে ইংরেজ পুরস্কার ঘোষণা করেছে, ফলে দেখবার বিপদ আছে!' উদ্বিগ্ন বৃদ্ধা বললেন, 'থাক বাবা, দেখবার দরকার নেই, আল্লা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন।' সূর্য সেন এ কথা কিন্তু ভুলে যান নি। তখন পরিচয় দিতে না পারলেও সহকর্মীদের তিনি বলেছিলেন, বৃদ্ধাকে পরবর্তীকালে জানাতে যে, সূর্য সেনকে তিনি দেখেছেন এবং তাঁর তৈরি তালের পিঠে খাইয়েছেন। আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে সহকর্মীরা এই বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে এই সংবাদ জানিয়েছিলেন। অতি এই ছোট ঘটনাও মাস্টারদার গভীর সংবেদনশীল হৃদয়ের আরেকটা দিককে দেখিয়ে দেয়। সূর্য সেন দীর্ঘ আলোচনা বা বক্তৃতা দিতেন না। অতি স্বল্প কথায় এমন কিছু বলতেন, যেটা অপরের হৃদয়ের মর্মস্থলকে স্পর্শ করতো, বিবেককে জাগিয়ে তুলতো। তাঁর এই মমস্পর্শী আবেদন, আচার-আচরণ, সহজ সরল আন্তরিকতা, অনাড়ম্বর

জীবন, দরদী মন দুর্দমনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করতো। তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পেলে বা পরিচিত হতে পারলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করতো। তিনি তাদের বলতেন, 'জন্মেছি যখন মৃত্যু তো অনিবার্য। মরবই যখন, তখন সার্থক মৃত্যুবরণই শ্রেয় নয় কি? কোটি কোটি মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের পথে যে মৃত্যু আসবে, তাই আমরা বরণ করব।' জীবন আর মৃত্যু দুই-ই এক ছিল এই মহান বিপ্লবীর কাছে। জয়ে-পরাজয়ে, সাফল্যে-ব্যর্থতায়, আনন্দে-বেদনায়, গভীর সংকটে-দুর্যোগে তিনি ছিলেন ধীর, স্থির, অবিচলিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই যুগে বিপ্লবী গোষ্ঠীদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল বিনা প্রশ্নে নেতার নির্দেশ মেনে চলা। এই ক্ষেত্রেও মাস্টারদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি বলতেন, 'যে আদর্শ, যে যুক্তি মন থেকে গ্রহণ করতে পার না, সেটা গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ সব কিছুই যেন যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করা হয়, অন্ধ বা যান্ত্রিকভাবে যেন তা না করা হয়। আমি বললেও গ্রহণ করবে না।' আর বলতেন, 'আমরা হত্যা করি ঠিক, অত্যাচারী শাসককে হত্যা আমাদের করতে হয়। চোর ডাকাতরাও হত্যা করে। কিন্তু আমরা সে ধরনের হত্যাকারী নই। দেশের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য যারা শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়, লড়তে গিয়ে হত্যাও করতে হয়। কিন্তু মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাদের কোন অংশেই কম নয়।' তারপর দেশবন্ধুর একটা কথা বলেছেন। দেশবন্ধু একবার বলেছিলেন, 'দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমরা অপরাধী'। মাস্টারদা বলেছেন, 'আমাদের দয়ামায়া নেই, দেশের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের সব। স্বাধীনতাই আমাদের সব।' এখানেও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর ঐতিহাসিক উক্তির যেন প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সব্যসাচী বলেছেন — 'আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই, পাপ পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ...ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটি মাত্র সাধনা । এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ।'

মাস্টারদা আরেকটা আলোচনায় বলেছেন, 'দেশ আগে, ধর্ম ন্যায় সত্য অনেক পরে। বিপ্লবীদের লড়াই ন্যায়সঙ্গত কিনা, সত্য কিনা, ধর্ম কিনা - এটাই বড় কথা'। এই প্রসঙ্গেও শরৎচন্দ্রের সব্যসাচীর আরেকটি উক্তি স্মরণ করুন। এখানেও কিছুটা তার প্রভাব পাওয়া যায়। যদিও শরৎবাবুর চিন্তা আরও উন্নত। শরৎবাবু বলছেন, "তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য;— এই অর্থহীন নিস্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো, মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে

চলে। শ্বাশ্বত, সনাতন নয় — এরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।" এটা আরও উন্নত চিন্তার প্রকাশ। প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি মানে, যখন যা খুশি প্রয়োজনমতো বললাম, আর সেইটাই সত্য হয়ে গেল, তা নয়। এখানে সত্য কথাটা হচ্ছে সামাজিক মুক্তির প্রয়োজনে, সভ্যতার মুক্তির প্রয়োজনে নূতন সত্য খুঁজে বের করা। পুরাতন সত্য বা ধারণা যখন কালের অগ্রগতিতে, নূতন পরিস্থিতিতে অকার্যকরী হয়ে যায়, সেই অর্থে মিথ্যা হয়ে যায়, তখন যুগোপযোগী নূতন আদর্শ বা সত্য যেন খুঁজে বের করা হয়। ফলে সমাজের মুক্তির প্রয়োজনে, সভ্যতার মুক্তির প্রয়োজনে আদর্শের যে বিকাশ হয়, সেটাই তো সত্য। তাই চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। এতটা পরিপূর্ণভাবে না বললেও মাস্টারদার কথার মধ্যে এই ধারণা ছিল, 'দেশ আগে, ন্যায় ধর্ম সত্য অনেক পরে।' বোঝা যায়, সেই সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল, বিপ্লবী লড়াই ন্যায়ধর্মসঙ্গত কিনা, সত্যসঙ্গত কিনা। তার উত্তর দিতে গিয়ে মাস্টারদা এভাবে বলেছিলেন। মাস্টারদা একদিকে কর্তব্য পালনে কঠোর ছিলেন, অন্যদিকে স্নেহ-মায়া-মমতায় অত্যন্ত কোমল ছিলেন। তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর অনুগত কর্মীরা তাঁকে দেখত মা-বাবার মতো। এরকমই সম্পর্ক ছিল। কাউকে যখন লড়াইয়ে পাঠাচ্ছেন, যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে পাঠাচ্ছেন, মৃত্যু অবধারিত জেনেও পাঠাচ্ছেন, মাস্টারদা'র চোখমুখে মায়া মমতা ফুটে উঠত। যেন একটা বুকের পাঁজর চলে যাচ্ছে। কিন্তু কখনও বিচলিত হতেন না।

জালালাবাদের যুদ্ধে মাস্টারদার চরিত্রের মহৎ আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় আমরা দেখতে পাই। তিনি সর্বাধিনায়ক, কিন্তু যুদ্ধের সময় সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন লোকনাথ বলকে। সেখানে মাস্টারদা একজন সৈনিক। যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছেন, সেনাধিপতি লোকনাথ বল। অন্যরা তাঁকে স্যালুট দিচ্ছে, তিনিও স্যালুট নিচ্ছেন। মাস্টারদার নির্দেশ ও পরিকল্পনামতই লড়াই হচ্ছে। আবার তাঁরই মনোনীত সেনাপতির নেতৃত্বে তিনিও লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর। শত্রুপক্ষের প্রবল গোলাবর্ষণের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বের করতেন, কোন দিকে শত্রু পক্ষ দুর্বল যেখানে আঘাত করা যেতে পারে, আবার কোনদিকে ওরা শক্তিশালী, যেটা এড়িয়ে যেতে হবে। গোলা ফুরিয়ে গেলে সাপ্লাই করতেন, প্রয়োজনে অস্ত্র মেরামতির জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ঘুরে ঘুরে এগুলি করতেন। আবার জালালাবাদ যুদ্ধের শেষে যখন বেরিয়ে আসছেন, সে মুহূর্তের কথা একবার ভাবুন — তাঁর প্রাণাধিক সন্তান, সারি সারি গুলিবিদ্ধ মৃতদেহগুলি পড়ে আছে, বারবার প্রত্যেকের মুখের দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে দেখছেন। প্রতিটি মুখ কত আদরের, কত যত্ন নিয়ে এঁদের গড়ে

তুলেছেন, এঁদের নিয়ে কতদিনের কত আবেগময় স্মৃতি বুকের মধ্যে ঝড় তুলছে! আজ এঁদের ছেড়ে যেতে চোখের জল বাঁধ মানছে না। আবার চলেও যেতে হবে। যতক্ষণ তাঁরা বেঁচে আছেন, ততক্ষণ লড়াই করে যেতে হবে। তাই আবার শুরু করতে হবে। সদ্য শহীদ হওয়া বীর সহযোদ্ধাদের যাঁর কাছে যা কাগজপত্র ছিল সেগুলো সংগ্রহ করে, সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই বীর সৈনিকদের শেষ বৈপ্লবিক অভিবাদন জানিয়ে বের হয়ে গেলেন। ভেবে দেখুন। প্রত্যেকে তাঁর এক একজন সন্তান তো! প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মদানের পনের দিন বাদে বিজয়া দশমী উপলক্ষে মাস্টারদার রচনা কী মর্মস্পর্শী! তিনি লিখছেন, "আজ মনে পড়ছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করেনি, একটু সংকোচ করেনি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ... কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি — কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি — দেশের উপর গভর্নমেন্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে? ... আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? ... এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশী — সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথে আমি চলেছি — এখনও কোন দ্বিধা আসে নি। ... এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করছি? ... কিন্তু আমার মনে হয় আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি কান্নাটিকে বুকে চেপে ধরে আছি — এই আশায় যে, এ সকল পবিত্র শ্মশান-স্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত হবে।"

তাঁর সেই রচনার এই ক্ষুদ্র অংশটুকু পড়লেই বোঝা যায়, তিনি কত বড় দেশপ্রেমিক বিপ্লবী যোদ্ধা ছিলেন, কত বড় মহৎ চরিত্রের ও হৃদয়বৃত্তির অধিকারী ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে কত বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নিজের প্রাণাধিক প্রিয়, অসীম মমতায় গড়ে তোলা সন্তানদের বিপ্লবী যুদ্ধে আত্মদানের পর শোকার্ত একজন মহান বিপ্লবী নেতার মনের পরিস্থিতি কী হতে পারে, এই রচনার ছত্রে ছত্রে সেটা ফুটে উঠেছে। এই রচনার মধ্যেই আরেক জায়গায় শহীদ

প্রীতিলতা সম্পর্কে লিখছেন, "...পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। ...যাকে নিজ হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, ...সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, 'তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না', তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সেই হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল। ... এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম — হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম — প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে আর পাই নি। ...এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়তো তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনদিন ইতস্তত করিনি। মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোনদিন রাগ করিসও নাই। শেষ মুহূর্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গালি দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস। ...শেষ মূহূর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি ....।"

এই দেশে সেদিন শুধু ব্রিটিশ শাসকরাই অপপ্রচার করেছে তাই নয়, বিপ্লববিরোধী আপোষকারীরা বলতেন, সমস্ত বিপ্লববাদীরা খুনি, নিষ্ঠুর, এদের দয়ামায়া নেই। মাস্টারদার রচনার এই অংশটুকু শুনে কী মনে হয়? এজন্যই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, 'বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি।' প্রীতিলতার অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে কী গভীর আবেগে ও মমতায় এই বিপ্লবী নেতা অনুপম সাহিত্যশৈলীতে লিখেছেন, "স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটি পবিত্র ফুল, তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পুজারীকে কত বড়ই না মনে করেছিল। কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল মায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য। পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে। তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে যাওয়ার তার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে। শেষে মায়ের চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে।" এই লেখা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন, মানুষটির মন কেমন ছিল? কী আবেগ, কী স্নেহ-মমতা! বার বার মা কথাটার যে উল্লেখ আছে, সেই মা হচ্ছে মাতৃভূমি অর্থাৎ দেশ। প্রকৃতপক্ষে, দেশ মানে তো মানুষ।

সেই মানুষের দুর্দশা ঘোচানোর জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই মুক্তিযুদ্ধের বেদীতলেই তিনি প্রীতিলতাদের অর্ঘ্য হিসাবে নিবেদন করেছেন।

একবার ভেবে দেখুন, এইসব অসাধারণ চরিত্রদের, মাস্টারদা-প্রীতিলতাদের ভুলে গেলে কোনও জাতি দাঁড়াতে পারে? কোনও দেশ দাঁড়ায়? অথচ আমরা এঁদের ভুলে গেছি। আমাদের দেশের বর্তমান সরকারি দলের নেতাদের সুশাসনের কল্যাণে আমাদের এত অগ্রগতি ঘটেছে! স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে এইসব বিপ্লবী চরিত্র এ দেশেই তো জন্ম নিয়েছিল। অথচ স্বাধীন ভারতের আজ অবস্থা কী? এই কি যথার্থ স্বাধীনতা? এই স্বাধীনতার স্বপ্নই কি এঁরা দেখেছিলেন? এর জন্যই বিপ্লবীরা কি প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন? আমরা আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি! আজ নীতি-নৈতিকতাহীন সর্বাত্মক অন্ধকারে নিমজ্জিত এই দেশের দিকে কি তাকিয়ে মনে হয়, একদিন এই দেশে এই ধরনের উজ্জ্বল চরিত্ররা মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল শিখা জ্বালিয়েছিল! সাম্রাজ্যবাদী শাসনে শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষে যদি এটা সম্ভব হয়ে থাকে, আজ স্বাধীন দেশে চরিত্রের ভয়াবহ সংকট কেন?

ভারতীয় পুঁজিবাদ শুধু যে মানুষকে রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত করে পথের ভিখারি বানিয়েছে তাই নয়, মানুষের মনুষ্যত্বও ধ্বংস করেছে। আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে ১৯২৭ সালে পুঁজিবাদের এই মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী রূপ দেখেই নবজাগরণের আপোষহীন বিপ্লবী ধারার বলিষ্ঠতম প্রতিনিধি, সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে গভীর বেদনায় বলেছিলেন, 'সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। ... সভ্য মানুষে এ কথা বোধহয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।' তাই তিনি অতি দুঃখে বললেন, 'মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।' তাঁর এই উক্তির সাতচল্লিশ বছর বাদে ১৯৭৪ সালে সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ দুর্গাপুরে এক শ্রমিক সমাবেশে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী গণ আন্দোলনকে ধবংস করার জন্য কীভাবে ষড়যন্ত্র করছে, সেটা উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় জাতির ...নৈতিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর। তারা জানে যে শত অত্যাচার ও দমনপীড়ন করেও, না খেতে দিয়েও একটা জাতিকে ... বেশিদিন পদদলিত করে রাখা যায় না। ... শোষণ এবং দমন দিয়ে, পুলিশি শাসন ও মিলিটারি শক্তি দিয়ে শেষ

পর্যন্ত জনশক্তিকে দমানো যায় না, ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। জনশক্তি মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ায় যদি তারা সঠিক বিপ্লবী আদর্শের হদিশ পায় এবং তাদের নৈতিক বল অটুট থাকে। ... কিন্তু শয়তান শাসক-শোষক হিসাবে তাদের যেটির দরকার ছিল ... সেটি হচ্ছে, জাতির নৈতিক বল খতম করে দাও, জাতির চরিত্রকে মেরে দাও। তাহলে তারা না খেতে পেয়ে, শত অত্যাচারেও কুকুরের মত গুমরাতে থাকবে, ক্ষোভ প্রকাশ করবে, হয়ত কখনও বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহও করবে; কিন্তু সংগঠিত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দিতে পারবে না — বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবে না।' এই জন্যই তিনি বারবার গণআন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও নৈতিক বলের উপর খুবই জোর দিয়ে গেছেন। তিনি অতীতের বড় মানুষদের, নবজাগরণের মনীষীদের এবং বিপ্লবীদের চরিত্র ও জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে বারবার এদেশের ছাত্র-যুবকদের আবেদন জানিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, আজ আমরা আন্দোলনের যে স্তরে আছি, সেখানে সূর্য সেন, প্রীতিলতাদের মতো পরীক্ষার সামনে এখনও আমরা দাঁড়াইনি। আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে আছি। অবশ্য তার মধ্যেও রাষ্ট্রের অত্যাচার জুলুম সহ্য করতে হচ্ছে। আগামী দিনে যখন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দিকে যাওয়া হবে তখন রাষ্ট্রশক্তির ভয়াবহ হিংস্র আক্রমণ নেমে আসবে। এঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। অতীত যুগকে স্মরণ করা মানেই হচ্ছে, এইসব চরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়া, শিক্ষাগুলি থেকে সত্য আহরণ করা।

এখানে স্মরণ করা দরকার, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর এই দেশে আরেকটা জোয়ার এসেছিল। সারা দেশে সঞ্চিত বিক্ষোভের বারুদ যে বিস্ফোরণের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে এবং জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্রযুবকরা যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে। মেদিনীপুরে একের পর এক অত্যাচারী ব্রিটিশ জেলাশাসকদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছিলেন বিপ্লবীরা। সেখানকার বিপ্লবী যুবকরা ঘোষণাই করেছিলেন, কোনও ব্রিটিশ শাসককে এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে দেবেন না। বিপ্লবীরা এই ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। অত্যাচারী পেডিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত। তারপর একে একে ডগলাস্, বার্জকে একইভাবে দণ্ডিত করা হয়। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ শাসকরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এদিকে কুমিল্লায় দুই স্কুল ছাত্রী শান্তি-সুনীতি দুঃসাহসিকভাবে ব্রিটিশ পুলিশ সুপারকে গুলিবিদ্ধ করলেন। ঢাকায় পুলিশ

সুপারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। একের পর এক এই ধরনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ঘটতে থাকল। এসব ঘটনা দেশকে উত্তাল করে তুলেছিল। এর প্রভাবে পেশোয়ারে ভারতীয় সৈন্যরা নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি বর্ষণ করতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মহারাষ্ট্রের কেশপুরে থানা জ্বালিয়ে দিয়েছিল সংগ্রামী জনগণ। চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরে ধারাবাহিকভাবে এগুলো ঘটতে থাকে। এরপর '৪২-এর আগস্ট বিপ্লব মাথা তুলে দাঁড়াল। দ্বিতীয় সরকার গড়ে উঠল মেদিনীপুরের তমলুকে। নাম হ'ল স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার। চট্টগ্রামের পথে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আর একটি স্বাধীন সরকার। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন ও লড়াইয়ের ঘটনা তো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এইসব বৈপ্লবিক সশস্ত্র লড়াইগুলিও কিন্তু চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। একইভাবে ১৯৪৫ সালে নৌ-বিদ্রোহ সংঘটিত হল। একবার ভেবে দেখুন, চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় কী পরিস্থিতি সেদিন এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। গোটা দেশে তখন অগ্নিগর্ভ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, যা দেখে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় পুঁজিবাদ ও তার প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী আপোষকামী জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশবিভাগ মেনে অতি দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিল। সেদিন যদি দেশে একটা যথার্থ মার্কসবাদী দল থাকত, তাহলে কি এটা সম্ভব হতো? সারা দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত সকলের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের রূপ নিতে পারত যদি একটা যথার্থ মার্কসবাদী নেতৃত্ব থাকত। নিজেদের মার্কসবাদী পরিচয় দিয়ে সেদিন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সে কাজ করা তো দূরের কথা, উল্টো কাজই করে গেছেন। অথচ ১৯২৫ সালেই বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান পথপ্রদর্শক স্ট্যালিন ভারতবর্ষে যারা কমিউনিস্ট বলে পরিচিত, তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'ভারতের বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক বিপ্লবে ভীত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আপোষ করছে এবং বিপ্লববাদের বিরুদ্ধতা করছে। এ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে পেটি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলে আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা'। স্ট্যালিনের এই উক্তি আমি আগেই করেছি। সেদিন এটা সম্ভবও ছিল, কারণ এদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে দক্ষিণপন্থী গান্ধীজির বিকল্প হিসাবে বামপন্থী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে একসময়ে শুধু খাড়াই করেনি, গান্ধীজির প্রার্থীকে পরাস্ত করে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে জয়যুক্তও করেছিল। এরপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি

আপোষকামী দেশীয় পুঁজিবাদের স্বার্থে দক্ষিণপন্থী নেতারা যখন ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে কোণঠাসা করার ষড়যন্ত্র করলো, তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলো এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করলো, তদানীন্তন ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু স্ট্যালিনের গাইড লাইন অনুসরণ করে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়ালো না, বরং দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বকে অর্থাৎ বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বকেই সাহায্য করেছিল। এমনকী নেতাজী যখন ভারতবর্ষের বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঐতিহাসিক রামগড় সম্মেলনে সিপিআই-কে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন, তারা তাতে সাড়া দিলেন না। ১৯৪২ সালের আগস্ট সংগ্রামকে সমর্থন না করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে তারা সহযোগিতাই করেছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার নামে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে স্ট্যালিনের গাইড লাইন অনুসরণ করে পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী নেতৃত্ব ডঃ সান ইয়াৎ সেন-কে সমর্থন করে পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সফল করল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যা পারল, এরা তা পারল না কেন? কারণ এরা নামে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল, বাস্তবে মার্কসবাদী দলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়েই উঠতে পারেনি। তাই এদেশের এত বড় গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনের বেদনাদায়ক পরিণতি ঘটল। এই বেদনার সঠিক উপলব্ধিতেই সেই যুগের মনীষী ও বিপ্লবী যোদ্ধাদের অপূর্ণ স্বপ্ন সফল করা ও শোষিত জনগণকে শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রয়োজনেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটল।

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লববাদের একজন সৈনিক ছিলেন। চলার পথে তিনি মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন জীবন দর্শন হিসাবে। তিনিই আমাদের কাছে ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদের বিশেষীকৃত রূপকে তুলে ধরেছিলেন। আমরা যারা লড়াই চাই, সংগ্রাম গড়ে তুলতে চাই, আপামর জনগণের সত্যিকারের মুক্তি চাই, গণমুক্তি চাই, তাদের কাছে এদেশের মাটিতে মার্কসবাদের এই যথার্থ প্রয়োগের সংগ্রামটিকে অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। মাস্টারদার প্রতি যে শ্রদ্ধা নিয়ে, তাঁর জীবন থেকে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় দিকগুলিকে চর্চা করার যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন, এই স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, আমরা কেউই এটা করতাম না, আমিও এখানে আসতাম না, যদি না আমরা মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসতাম। এ দেশের মাটিতে মার্কসবাদের যথার্থ উপলব্ধির ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া

সত্যিকারের বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে যদি না আসতাম, তাহলে আমরাও অন্যদের মত কুৎসিৎ, গদিসর্বস্ব রাজনীতির স্রোতেই গা ভাসাতাম। সেক্ষেত্রে আমরাও রাজনীতির নামে রুচিহীনতা, চরম দুর্নীতি, মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, আত্মসর্বস্বতার পঙ্কে নিমজ্জিত হতাম, যা আজ কেন্দ্রে ও রাজ্যে সকল সরকারি ও তথাকথিত বিরোধী দলগুলি করছে। আমরা সেই পথে যেতে পারিনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। মানুষের মতো বাঁচার পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বলেছিলেন, অতীতের এই বিপ্লবীদের কাছ থেকে শিক্ষা না নিলে আজকের দিনের গণ আন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে তোমরা এক পাও চলতে পারবে না। এঁদের চরিত্রের শিক্ষা আত্মস্থ না করলে তোমরা মার্কসবাদও বুঝবে না, সর্বহারা বিপ্লবও বুঝবে না। এক্ষেত্রে তাঁর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বক্তব্য আজ এখানে উল্লেখ করছি। গভীর উদ্বেগ ও বেদনায় তিনি বলেছিলেন, "আজকের দিনে রাজনৈতিক আন্দোলন, গণ আন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতি, নৈতিকতা, রুচি সংস্কৃতির উচ্চ মানটা নেমে গিয়েছে। যে উঁচু মানটা একসময় এদেশে গড়েও উঠেছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি। তাই আমরা বড় কথা বলি, কিন্তু বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না। কোন আন্দোলনই তো শুধুমাত্র বুদ্ধির কারবার নয়, বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির কারবার। বিপ্লবটাও তাই। চিন্তা এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হৃদয়বৃত্তির আধারটা নীচু স্তরে নেমে থাকলে তো ব্যবধান হয়ে যাবে। তাহলে আন্দোলন এবং চিন্তাও শেষ পর্যন্ত বিপথগামী হবে। ফলে, পথ পাওয়া যাবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষের গণ আন্দোলনের স্তরে স্তরে যে নীতি-নৈতিকতা নেই — এই সত্য আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি। ... এই আন্দোলনের মধ্যে থেকে একটা কথা আমাকে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে। তা হচ্ছে এর নীতি নৈতিকতা, সংস্কৃতির সুর এবং আধার ধসে গিয়েছে। তাই আজ শুধু স্লোগান সর্বস্ব আন্দোলন হচ্ছে। ফলে, বারবার গমকে গমকে ফুলে ফুলে আসছে আন্দোলন — 'পরিবর্তন চাই, বিপ্লব চাই' বলে। মানুষ মরছে, যুবকরা মরছে। কিন্তু বিপ্লব হচ্ছে না। পরিবর্তন আসছে না। এইরকম বিচ্ছিন্ন, একান্তভাবে রুচি-সংস্কৃতি বহির্ভূত আন্দোলনে শুধু লড়াই করলে, প্রাণ দিলে তার দ্বারা পরিবর্তন আসে না। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে, নীতিভিত্তিক আন্দোলন হলে তবেই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া হবে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "সংস্কৃতির যে উচ্চ আধারটা স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় তৈরি হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলো আমরা বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি, কিন্তু দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মাস্টারদা সূর্য সেন

সংস্কৃতির সুরের সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। সেই যোগসূত্রটি গড়ে তুলতে হবে। অথচ তার সঙ্গে আজ বিরোধও অবশ্যম্ভাবী।" একদিকে তিনি বলেছিলেন এদেশের মাটিতে নবজাগরণের আপোষহীন ধারা এবং স্বদেশি আন্দোলনে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির উচ্চ সুরের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, সেই যুগের বড় মানুষ ও বিপ্লববাদের উন্নত চরিত্রের গুণাবলী আয়ত্ত করতে হবে; অন্যদিকে বলেছিলেন, সেই যুগের লড়াই ছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, আজকে লড়তে হচ্ছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, তাই সেই যুগের আদর্শ ও চরিত্রের মান নিয়ে আজকের দিনের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন চলবে না, তাই বিরোধও ঘটবে। আজ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী বিপ্লবী মতবাদ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সর্বহারা সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে লড়তে হবে এদেশের নবজাগরণের ও স্বদেশি বিপ্লবীদের উত্তরসাধক হিসাবে। ফলে, প্রথমে সেই যুগের উন্নত স্তরকে আত্মস্থ করে তারপর সেই স্তরকে অতিক্রম করে সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ ও সংস্কৃতি অর্জন করতে হবে। তাই বলেছেন, আগে সেই যুগ থেকে গ্রহণ কর, আহরণ কর, তারপর সেই স্তর অতিক্রম করে নূতন স্তরে উন্নীত হতে হবে। কিন্তু সেই যুগ থেকে গ্রহণ না করতে পারলে ছিন্নমূল হয়ে যাবে, নতুন আদর্শ ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পারবে না। শুধু বড় কথা শিখবে, আর বড় বড় কথা আওড়াবে, কিন্তু চরিত্র অর্জন করতে পারবে না। যথার্থ মার্কসবাদী হতে পারবে না। ফলে আজ এখানে আমাদের সমবেত হয়ে বিপ্লবী মাস্টারদার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন সে যুগের মহান বিপ্লবী সংগ্রামগুলি থেকে, অসাধারণ চরিত্রগুলি থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আজকের এই আলোচনা সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের একজন ছাত্র হিসাবে আমি উপস্থিত হয়েছি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, মাস্টারদা সূর্য সেন সহ অসংখ্য বিপ্লবীদের অবিস্মরণীয় চরিত্র, সংগ্রাম ও আত্মদানকে স্মরণ করে, তাঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের দিনে সমাজ ও সভ্যতার চরম শত্রু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে বিপ্লবী সংগ্রামকে যেন আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই লক্ষ্য নিয়েই আপনাদের বিবেকের সামনে কিছু কথা রেখে গেলাম।